HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৪ • সংখ্যা ৩ • সেপ্টেম্বর ২০০৬
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

গ্রামবাংলার অবিবাহিত কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থান, পুষ্টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং চর্চা

পৃষ্ঠা ১০

ভিব্রিও কলেরি ও১ এল-এর ইনাবা সেরোটাইপের পুনরুত্থান এবং টেট্রাসাইক্লিনের প্রতি এর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি

পৃষ্ঠা ১২

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

বাংলাদেশে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসার নতুন কৌশল

বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলার ১৩টি মারাত্মকভাবে ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত। ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধসমূহের বিরুদ্ধে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে ওঠায় এবং এ-রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থতা ও মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। দুটি ভিন্ন গবেষণায় ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় দু'টি পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর একটিতে দেখা গেছে, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত– ৬৩জন রোগীর মধ্যে যারা প্রতিদিন তিনবার করে তিনদিন ধরে কুইনাইন এবং পরে সালফাডোক্সিন/ পাইরিমেথামাইন-এর একটি ডোজ সেবন করেছে, ৪২ দিনে তাদের ৮৭% রোগী আরোগ্য লাভ করেছে। অন্যটিতে সাতষট্টি জন রোগীর মধ্যে যারা আরটিমিথারের সাথে লুমেফ্যানট্রিন নিয়েছে তাদের মধ্যে ৯৪% রোগী ৪২ দিনে ভাল হয়ে গেছে। উভয় পদ্ধতিতে একটি ওষুধের সাথে আর একটি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা বাংলাদেশে কার্যকর দেখা গেছে। বাংলাদেশে কার্যকর ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধ ব্যাপকভাবে সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এখানে প্রতি বছর ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ৫৭,০০০

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

ম্যালেরিয়া রোগীসহ ৪০০,০০০ ম্যালেরিয়া রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ৫০০ জনের বেশি রোগী মারা যায় (১)। দেশের ৬৪টি জেলার ১৩টিই মারাত্মকভাবে ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত, যেসব স্থানে দেশের প্রায় ৯৯% ম্যালেরিয়া-সংক্রান্ত সমস্যা বিরাজমান (চিত্র ১)। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত রোগীসমূহের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রোগী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। তবে পর্যাপ্ত অর্থাভাবের ফলে ম্যালেরিয়ার ওপর গবেষণা, সার্ভিলেন্স এবং নিয়ন্ত্রণের যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাতে মনে হয় এ-রোগসম্পর্কিত সমস্যা প্রকাশিত তথ্য থেকে আরো অনেক ব্যাপক। এসব জেলাসমূহে সবচেয়ে বেশি ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হচ্ছে দুর্গম পার্বত্য এলাকা এবং এর সন্নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব সীমানা এলাকার সংখ্যালঘু জনগণ। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ইতোপূর্বে সাফল্য থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে ম্যালেরিয়া রোগী এবং *প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম*-এর সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে, ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধসমূহের বিরুদ্ধে এর প্রতিরোধী হয়ে ওঠা এবং এজাতীয় প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় এ-রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর হার বেড়ে গিয়ে তা এখন এক মারাত্মক সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুত, বেশিরভাগ ম্যালেরিয়া পরজীবীই সম্ভবত ক্লোরোকুইন-প্রতিরোধী (২,৩)। তারপরও ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে অপর্যাপ্ত অর্থ এবং বর্তমানে ওষুধসমূহের রোগ-প্রতিরোধী হয়ে ওঠা-সংক্রান্ত

চিত্র ১: ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ১৩টি উচ্চ ম্যালেরিয়া-প্রবণ (এনডেমিক) জেলাসমূহ

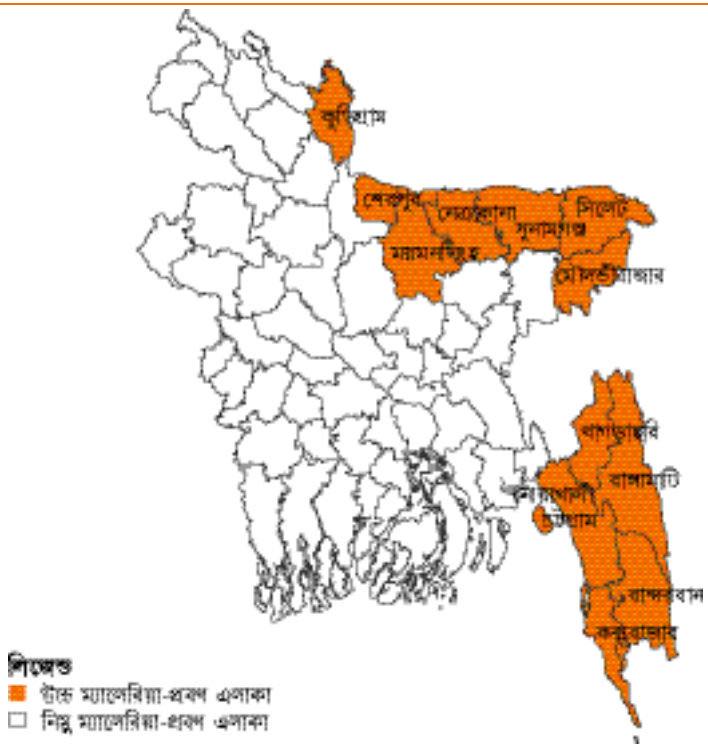

পর্যাপ্ত উপাত্তের অভাব এবং সেই সাথে সাশ্রয়ী বিকল্প চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার অভাবে দেশব্যাপী এখনো ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ক্লোরোকুইনই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত দুটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা পরীক্ষা করেছি। প্রথমত, চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ায় অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি-র মাঠ এলাকায় জটিল নয় এমন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিসায় তিনদিনব্যাপী কুইনাইন এবং পরে সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন দিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে এসব ওষুধের রোগনাশক (থেরাপিউটিক) কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছি। অন্যদিকে আলাদাভাবে প্রত্যেক রোগীর জীবাণুর প্রতি ওষুধের সংবেদনশীলতা পরীক্ষার জন্য আমরা ল্যাবরেটরি-নির্ভর প্রযুক্তি (ওষুধ সংবেদশীলতা অ্যাসে এইচআরপি২) ব্যবহার করেছি।

২০০৪ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় ৬৩ জন রোগীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয় (৪)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণাটিকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে ৪২দিন পর্যন্ত ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধের কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়। ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় সব রোগীকেই দৈনিক তিনবার করে তিনদিন ধরে কুইনাইন দিয়ে দ্বিতীয় সারির চিকিৎসা দেওয়া হয় (প্রতি ডোজ ১০ মিলিগ্রাম/কেজি হিসেবে) এবং সেই সাথে চতুর্থ দিনে ২৫ মিলিগ্রাম/কেজি সালফাডোক্সিনের সাথে ১.২৫ মিলিগ্রাম/কেজি হিসেবে পাইরিমেথামাইনের একটি ডোজ দেওয়া হয়। জটিল নয় এমন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় প্রথমে কুইনাইন এবং পরে সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন প্রয়োগ করে পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ৪২ দিনের পর্যক্ষেণ শেষে দেখা গেছে যে, মোটের ওপর ৮৭.৩% রোগী আরোগ্য লাভ করেছে (চিত্র ২)। একজন

চিত্র ২: পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে কুইনাইনের সাথে সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে জটিল নয় এমন ৬৩ জন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসায় আরোগ্যলাভের হার (কাপলান-মিয়ার রেখার সাহায্যে দেখানো)

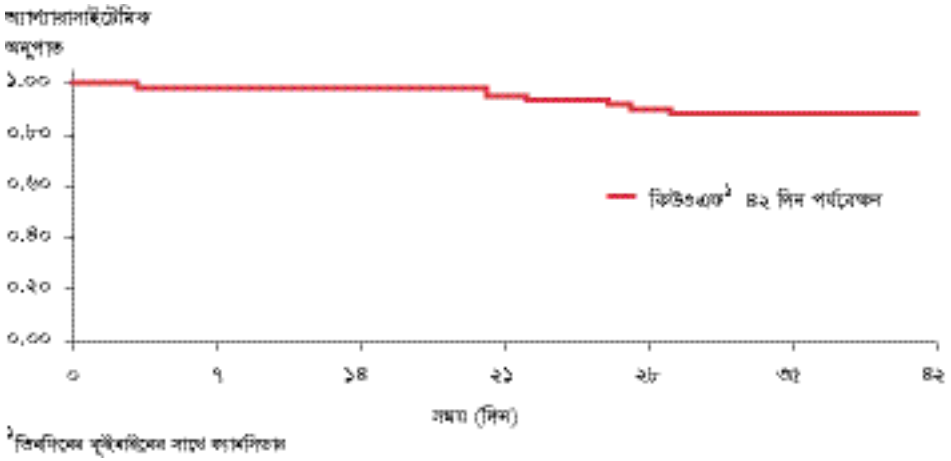

রোগীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং ছয়জনের ক্ষেত্রে ২৭ দিনের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ দেরিতে চিকিৎসায় ব্যর্থতা দেখা গেছে। পাইরিমেথামাইনের অকার্যকারিতাই এই চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে *ইন ভিটরো* পরীক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে।

খাঁটি ওষুধসমূহের প্রতি ম্যালেরিয়ার এসব পরজীবীর সংবেদনশীলতা-সংক্রান্ত উপাত্ত সরবরাহের জন্য সমপর্যায়ের *ইন ভিটরো* (দেহের বাইরে কোনো টিউবের মধ্যে) গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। *ইন ভিটরো* উপাত্ত থেকে পাওয়া ক্লোরোকুইন প্রতিরোধের মাত্রা (৫০% ইনহিবিটরি কনসেনট্রেশন = ৯৩.১ ন্যানোমোল) থাইল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সাথে তুলনা করা যায়, যে দেশটি উচ্চমাত্রায় ওষুধ প্রতিরোধের জন্য পরিচিত। তবে এই জীবাণুগুলো কুইনাইন (৭৩.২ ন্যানোমোল) এবং মেফলোকুইনের (১১.৩ ন্যানোমোল) প্রতি মোটামুটিভাবে সংবেদনশীল। ডাইহাইড্রোআরটিমিসিনিন ইনহিবিটরি কনসেনট্রেশনসমূহ একইরকমভাবে কম ছিলো যাতে বোঝা যায় যে, পরজীবীগুলো ওই ওষুধটির প্রতি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল ছিলো। মজার ব্যাপার হলো, *ইন ভিটরো* পরীক্ষায় পাইরিমেথামাইনের প্রতি সংবেদনশীলতা (১.৭ মাইক্রোমোল) এবং রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহের প্যারামিটারের মধ্যে একটি গভীর আন্তঃসম্পর্ক ছিলো। এ-থেকে বোঝা যায় যে, চিকিৎসার ফলাফলের ওপর পাইরিমেথামাইন ওষুধের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিলো।

কুইনাইন এবং সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইনের চিকিৎসায় ৪২ দিনের পর্যবেক্ষণ শেষে ম্যালেরিয়া থেকে আরোগ্যলাভের যে হার পাওয়া গেছে তা নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত পূর্ববর্তী একটি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত আরোগ্য লাভের হারের সাথে তুল্য, যেখানে একই ওষুধ ব্যবহার করে ২৮ দিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (৫)। এ-উপাত্তসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত আরটিমিসিনিনজাতীয় ওষুধসমূহ না পাওয়া যায়, ততদিন বিকল্প হিসেবে তিনদিন যাবৎ কুইনাইন এবং চতুর্থ দিনে সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইনের একটিমাত্র ডোজ দিয়ে চিকিৎসা যথেষ্ট কার্যকর এবং সাশ্রয়ী হবে।

২০০৪/২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় প্রথম সারির ওষুধের পরিবর্তন এনে আরটিমিথার ও লুমেফ্যানট্রিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেয় (১)। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো জটিল নয় এমন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আরটিমিথার-লুমেফ্যানট্রিন-এর ছয়টি ডোজ দিয়ে চিকিৎসার প্রারম্ভিক কার্যকারিতা নির্ণয় করা (৬)। গবেষণায় ৬৭ জন রোগীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ৪২ দিনের পর্যবেক্ষণ শেষে আরোগ্য লাভের হার ছিলো ৯৪.৩%। এ-চিকিৎসায় দ্রুত জ্বর পড়ে গেছে (২৫.৮২ ± ১২.১৪ ঘণ্টায়) এবং ম্যালেরিয়ার পরজীবী বিনষ্ট হয়েছে (৩০.৩৬ ± ১৯.৪৩ ঘণ্টায়)। এ-উপাত্তসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় উল্লিখিত ওষুধসমূহ খুবই কার্যকর। তবে ওষুধসমূহের উচ্চমূল্য এবং যোগান-সংকটের কারণে বাংলাদেশে এগুলোর ব্যবহার এখনো সীমিত।

প্রতিবেদক: ল্যাবরেটরি সায়েন্সেস ডিভিশন, হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন আইসিডিডিআর,বি; ইনস্টিটিউট অব স্পেসিফিক প্রোফাইল্যাক্সিস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মেডিকেল ইউনিভারসিটি অব ভিয়েনা, অট্রিয়া এবং আর্মড ফোরসেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

অর্থানুকুল্য: ইউএস ডিপার্টমেন্সট অব ডিফেন্স গ্লোবাল ইমার্জিং ইনফেকশন সিস্টেম এবং অস্ট্রিয়ান সায়েন্স ফান্ড

মন্তব্য

যেখানে আরটিমিসিনিনজাতীয় ওষুধসমূহ সহজলভ্য নয়, সেখানে বিকল্প হিসেবে তিনদিনের কুইনাইন এবং চতুর্থ দিনে সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইনের একটিমাত্র ডোজ দিয়ে জটিল নয় এমন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা যথেষ্ট কার্যকর। কুইনাইন এবং সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন উভয়ই স্থানীয় উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে সহজে পাওয়া যায় এবং তুলনামূলকভাবে দামও কম। একই ধরনের অন্যান্য চিকিৎসার (যেমন– সাতদিনের কুইনাইনের সাথে টেট্রাসাইক্লিনের ডোজ) তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে এর দ্বারা চিকিৎসা করা যায় বলে এর কার্যকারিতাও অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে ওষুধের *ইন ভিটরো* সংবেদনশীলতা-সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে *পি. ফ্যালসিপেরাম* পরজীবীসমূহ স্বল্পমাত্রায় সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন-প্রতিরোধক। অতএব, সালফাডোক্সিন/পাইরিমেথামাইন কেবলমাত্র ওইসব ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধের সাথে ব্যবহার করা উচিত যেগুলো দ্রুত কাজ করে এবং কোনো জীবাণুর প্রতিরোধী হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে দ্রুত ভিন্ন কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত জটিলতাবিহীন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় বাংলাদেশে বর্তমানে প্রথম সারির ওষুধ হচ্ছে আরটিমিথারের সাথে লুমেফ্যান্ট্রিন, যেসব ওষুধ দ্বারা ম্যালেরিয়া থেকে আরোগ্য লাভের হার ৯০%-এরও বেশি। ওষুধগুলো দ্বারা খুব দ্রুত জ্বর সেরে যাওয়া এবং পরজীবী বিনষ্ট হওয়ার ফলে এগুলো দ্রুত ক্লিনিক্যাল এবং প্যারাসাইটোলোজিক্যাল উন্নয়নে প্রধান ওষুধ হিসেবে কাজ করছে। তবে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসায় ওষুধগুলো কতখানি নিরাপদ তা এখনো জানা যায় নি এবং এগুলোর উচ্চমূল্য ও যোগান সংকটের কারণে বাংলাদেশে এগুলোর ব্যবহার এখনো সীমিত। অধিকন্তু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরটিমিসিনিনজাতীয় ওষুধসমূহের চিকিৎসায় প্রথম ব্যর্থতা দেখা দেওয়ায় বিকল্প নতুন ওষুধের সন্ধানে জরুরীভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে (৭)।

সুতরাং বাংলাদেশে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় নতুন, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী ওষুধের সন্ধানে আমরা আমাদের গবেষণা কার্যক্রমকে ২০০৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছি।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহে ম্যালেরিয়া রোগের গবেষণা এবং নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করার মতো নতুন, সাশ্রয়ী এবং টেকসই ইন্টারভেনশন কলা-কৌশল প্রবর্তন করা খুবই জরুরী। অতএব, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় নতুন এবং সাশ্রয়ী ওষুধসমূহ, বিশেষ করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত ওষুধসমূহের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগুলোর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অপরিহার্য।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

গ্রামবাংলার অবিবাহিত কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থান, পুষ্টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং চর্চা

বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পকর্তৃক পরিচালিত ২০০৪ সালের বেজলাইন সার্ভের মাধ্যমে গ্রামবাংলার অবিবাহিত কিশোরীদের (১৩-১৯ বছর বয়সী) পুষ্টিগত অবস্থান, পুষ্টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং চর্চা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ওই বয়সী কিশোরীদের বেশ পুষ্টিহীন দেখা গেছে; তাদের শতকরা নয়জন ছিলো খুবই হালকা-পাতলা এবং ১৬% ছিলো মাঝারি ধরনের হালকা-পাতলা। তাদের অর্ধেকেরও বেশি শক্তিদায়ক এবং আমিষজাতীয় কোনো খাবারের নাম জানত না। উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য এ-বয়সে যে তাদের অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন অধিকাংশ কিশোরীই (৬৫%) তা জানতো। কিশোরীদের কাছ থেকে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার পূর্ববর্তী সপ্তাহে একজন কিশোরী গড়ে প্রায় পাঁচবার আমিষজাতীয় খাবার এবং তিনবার চর্বিজাতীয় খাবার খেয়েছে। কিশোরীদের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে তৈরি পুষ্টি তালিকায় দেখা গেছে যে, পূর্ববর্তী সপ্তাহে সবচেয়ে কম আয়ের পরিবারের কিশোরীদের থেকে সবচেয়ে বেশি আয়ের পরিবারের কিশোরীদের ৫৪%-এর মাছ অথবা মাংস এবং ৯১%-এর ডিম অথবা দুধ খাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশি। মূল সেবাকার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তিশালী কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি-পরামর্শের সাহায্যে কিশোরীদের পুষ্টিজ্ঞান ও চর্চা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শৈশব থেকেই তারা যাতে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সেই জ্ঞানও তারা অর্জন করতে পারে।

কৈশোরকালীন সময়টি দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির সময়। তাই পরিপূর্ণভাবে শারীরিক বৃদ্ধির জন্য এই সময়টিতে দেহে অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন। কৈশোরকালীন উন্নত পুষ্টিজ্ঞান ও চর্চা কিশোরীদের পুষ্টিসমস্যা সমাধানের একটি সুযোগ করে দেয়, যার ফলে শৈশব থেকেই তারা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে যৌবনে পদার্পণ করতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের কিশোরীরা বেশ পুষ্টিহীন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের শহরতলীতে ১১-১৬ বছর-বয়সী ২৭% ছাত্রী রক্তশূন্যতায় (হিমোগ্লোবিন <১২ গ্রাম/লিটার) ভুগছে এবং ১৭%-এর মধ্যে মারাত্মকভাবে লৌহজাতীয় উপাদানের (সিরাম ফেরিটিন <১২ মাইক্রোগ্রাম/লিটার) ঘাটতি রয়েছে (১)। কিশোরীদের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নের একটি উপায় হতে পারে পুষ্টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আহরণ ও এর চর্চার মাধ্যমে। আজকের কিশোরীরা আগামীদিনের মা, যারা পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এ-সংক্রান্ত গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কিশোরীদের পুষ্টিজ্ঞান ও চর্চা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি।

কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থান, পুষ্টি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং চর্চা পর্যালোচনা করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পকর্তৃক পরিচালিত ২০০৪ সালের বেজলাইন সার্ভের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে (২)। একশ তেরটি উপজেলার (বাংলাদেশের মোট উপজেলার প্রায় এক-চতুর্থাংশ) ৭০৮টি গুচ্ছ এলাকা থেকে দৈবচয়নের

ভিত্তিতে ১৩-১৯ বছর-বয়সী ৫,১০৬ জন অবিবাহিত কিশোরীকে সাক্ষাৎকারের জন্য বেজলাইন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপজেলাসমূহ জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এনএনপি - যেখানে পুষ্টি ইন্টারভেনশন কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি) এবং বাংলাদেশ সমন্বিত পুষ্টি প্রকল্পের (বিআইএনপি - যেখানে ১৯৯৫-২০০২ সাল পর্যন্ত পুষ্টি কার্যক্রম চালু রয়েছে) এলাকা অনুযায়ী আলাদাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বিআইএনপি এলাকায় কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিশিক্ষা প্রদান এবং লৌহ ও ফলিক-এসিডজাতীয় খাদ্যউপাদান সরবরাহ করা হয়েছে (৩)। কিশোরীদের পুষ্টিজ্ঞান ও চর্চা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষিত মহিলা সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা তাদের বাড়ি পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের খাদ্য সম্পর্কে জানার জন্য সাতদিনে তারা যেসব খাবার খেয়েছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিশোরীদের বেশিরভাগই ছিলো কম-বয়সী। তাদের ৪৩% ছিলো ১৩-১৪ বছর-বয়সী, ৩৭% ছিলো ১৫-১৬ বছর-বয়সী এবং ১৯% ছিলো ১৭-১৯ বছর-বয়সী (সারণি ১)। এই গবেষণায় অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের কিশোরীদের অন্তর্ভুক্তি ছিলো কম, কারণ তাদের অধিকাংশই ছিলো বিবাহিত, ফলে তারা এ-গবেষণায় অংশগ্রহণের যোগ্য ছিলো না। কিশোরীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এদের ৬৯% ছিলো ষষ্ঠশ্রেণী পাশ বা তার থেকে বেশি শিক্ষিত, এবং মাত্র শতকরা ছয়ভাগ ছিলো দশম শ্রেণী পাশ। এদের মধ্যে খুব কম কিশোরীই (৪%) ছিলো যারা কখনো বিদ্যালয়ে যায় নি। পেশায় এদের ৬৬% ছিলো ছাত্রী এবং বাকীদের বেশিরভাগ গৃহস্থালির কাজ করতো (২৯%), আর অন্যরা (৪%) কোনো না কোনো রোজগারের সাথে জড়িত ছিলো।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কিশোরীরা বেশ পুষ্টিহীন ছিলো। তাদের শতকরা নয়জন ছিলো খুবই হালকা-পাতলা (বয়সভিত্তিক বিএমআই: নিচের শতকরা পাঁচ জন), ১৬% ছিলো মাঝারিধরনের হালকা-পাতলা (নিচের শতকরা ১৫ জন) এবং কেউই অতিরিক্ত মোটা ছিলো না (শতকরা ৯৫ জনের উপরে)। অত্যন্ত হালকা-পাতলা এবং মাঝারিধরনের হালকা-পাতলা মেয়েদের মধ্যের স্বাস্থ্যগত এই পার্থক্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য নয়।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে কিশোরীদের জ্ঞান ছিলো সীমিত। তাদের কাছে যখন প্রধান প্রধান শক্তিসমৃদ্ধ খাদ্যসমূহের নাম জানতে চাওয়া হয়, তখন ৩১% বলেছে ভাতের কথা এবং ১২% উল্লেখ করেছে গমের নাম এবং এগুলোই ছিলো সঠিক উত্তর। তাদের অর্ধেকেরও কম সঠিকভাবে আমিষজাতীয় খাদ্যের কথা বলতে পেরেছে। আমিষজাতীয় খাদ্য হিসেবে ডালের কথা বলেছে ২০%, মাংসের কথা বলেছে ৩২% এবং মাছের কথা বলেছে ৪২%। খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) এবং খনিজজাতীয় খাদ্যউপাদান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিলো অপেক্ষাকৃত ভালো। এ-বিষয়ে ৭৫% শাক-শবজির কথা এবং ৫১% ফলমূলের কথা বলেছে।

উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য এ-বয়সে যে তাদের অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন অধিকাংশ কিশোরীই (৬৫%) তা জানতো। আর তাদের এই জ্ঞান ছিলো তাদের শিক্ষা ও পরিবারের সম্পদের সাথে সম্পর্কিত (সারণি ১)।

লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণকারী কিশোরীদের মধ্যে শতকরা আটভাগ ছিলো

সারণি ১: বয়স, শিক্ষা, পরিবারিক সম্পদ এবং এনএনপি ও বিআইএনপি-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অতিরিক্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদানের প্রয়োজন আছে বলে যেসব কিশোরী জানিয়েছে তাদের শতকরা হার

বৈশিষ্ট্যসমূহ	কিশোরীর শতকরা হার	যারা অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানে তাদের শতকার হার	যারা কখনও লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান খেয়েছে তাদের শতকরা হার
বয়স (বছর)			
১৩-১৪ (রেফারেন্স)	৪৩	৫৫	৯
১৫-১৬	৩৭	৬৮**	১৪*
১৭-১৯	১৯	৭৮**	১৯*
শিক্ষার স্তর			
প্রাথমিক পর্যায় (রেফারেন্স)	৩১	৪৫	৮
মাধ্যমিক +	৬৯	৭৪**	১৫*
পরিবারের সম্পত্তি			
সবচেয়ে কম (রেফারেন্স)	২০	৪৭	৯
নিচ থেকে দ্বিতীয়	২০	৬০**	১১
মধ্যম	২০	৬৫**	১৩
নিচ থেকে চতুর্থ	২০	৭০**	১৫
সর্বোচ্চ	২০	৮১**	১৫
গবেষণা এলাকা			
এনএনপি প্রকল্প (রেফারেন্স)	৬২	৬৩	৮
বিআইএনপি প্রকল্প	৩৮	৬৭*	২১**
মোট	১০০	৬৫	১৩

*পি<০.০৫, **পি<০.০১ (রেফারেন্স দলের তুলনায়)

এনএনপি এলাকায় এবং ২১% ছিলো বিআইএনপি এলাকায়। উভয় এলাকায়ই লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণের সাথে তাদের উচ্চতর শিক্ষার সম্পর্ক ছিলো। উভয় এলাকার যেসব কিশোরী তাদের এ-বয়সে অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজনের কথা জানতো তাদের মধ্যেও লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণকারীর হার ছিলো বেশি। লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যগ্রহণের সাথে পারিবারিক অবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, বিগত সপ্তাহে কতদিন তারা মাছ, মাংস, দুধ বা ডিমের মতো বিশেষ বিশেষ খাবার খেয়েছে। উত্তরে তারা জানিয়েছে যে, তারা আমিষজাতীয় (মাছ/মাংস) খাদ্য গ্রহণ করেছে গড়ে প্রায় পাঁচ দিন এবং চর্বিজাতীয় (ডিম/দুধ) খাদ্যগ্রহণ করেছে গড়ে প্রায় তিন দিন (সারণি ২)। পারিবারিক সম্পদ কিশোরীদের আমিষ এবং চর্বি গ্রহণের ওপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সবচেয়ে কম আয়ের পরিবারের কিশোরীদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আয়ের পরিবারের কিশোরীদের ৫৪%-এর মাছ অথবা মাংস এবং ৯১%-এর ডিম অথবা দুধ খাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বেশি।

সারণি ২: পারিবারিক সম্পদের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারগ্রহণের পূর্ববর্তী সপ্তাহে কিশোরী মেয়েদের আমিষ এবং চর্বিযুক্ত খাদ্যগ্রহণের গড় দিন (এবং ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল)

পরিবারে সম্পত্তির পরিমাণ	আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য		প্রতিটি শ্রেণীভুক্ত কিশোরীর সংখ্যা
	মাছ/মাংস খাওয়ার গড় দিন (৯৫% সিআই)	ডিম/দুধ খাওয়ার গড় দিন (৯৫% সিআই)	
সবচেয়ে কম	৩.৮ (৩.৭-৪.০)	২.২ (২.০-২.৩)	১০১১
নিচ থেকে দ্বিতীয়	৪.১ (৪.০-৪.৩)	২.৯ (২.৭-৩.০)	১০৩১
মধ্যম	৪.৬ (৪.৫-৪.৮)	৩.৫ (৩.৩-৩.৬)	১০২২
নিচ থেকে চতুর্থ	৫.২ (৫.১-৫.৩)	৩.৮ (৩.৭-৪.০)	১০২১
সর্বোচ্চ	৫.৯ (৫.৮-৬.০)	৪.২ (৪.০-৪.৪)	১০১১
মোট	৪.৭ (৪.৭-৪.৮)	৩.৩ (৩.২-৩.৪)	৫১০৬

প্রতিবেদন: ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন (আইপিএইচএন), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (নিপোর্ট) এবং ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন ও পাবলিক হেলথ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য:জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প ও কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি

মন্তব্য

বংশপরম্পরায় কমপুষ্টিতে ভোগার দুষ্টচক্র প্রতিহত করতে কিশোরী মেয়েদের পুষ্টিশিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর সঠিক সমাধান যদি খুঁজে বের করা না যায়, তাহলে কিশোরী মেয়েরা কমপুষ্টিতে ভোগার এই চক্রে স্থায়ীভাবে ঘুরপাক খাবে (কমপুষ্টিতে ভোগা মা স্বল্প ওজনবিশিষ্ট শিশু জন্ম দেবে এবং সেই শিশু কমপুষ্টিতে ভুগতে ভুগতে বড় হয়ে একদিন পুষ্টিহীন কিশোরী হবে)। গ্রামবাংলার কিশোরী মেয়েদের বিয়ে এবং গর্ভবতী হওয়ার উচ্চহার তাদেরকে কমপুষ্টিতে থাকার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় (৪)। আলোচ্য গবেষণায় গ্রাম এলাকায় ২৫% কিশোরীকে দেখা গেছে হালকা-পাতলা (খুব বেশি এবং মাঝারি ধরনের)।

গ্রাম এলাকার বেশিরভাগ কিশোরীরই বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে জ্ঞানের সল্পতা ছিলো। তাদের অনেকেই (৩৫%) জানতো না যে, উল্লেখযোগ্যভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য কিশোরী বয়সে অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন। ভবিষ্যতে পরিবারের, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ব্যবস্থা করতে কিশোরীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করে তাদের পুষ্টিজ্ঞান এবং চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ-সংক্রান্ত ইন্টারভেনশন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

জ্ঞান এবং পরিবারের সম্পদের স্বল্পতার কারণে কিশোরীদের পুষ্টিজাতীয় খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিশোরীদের শরীরে উচ্চমাত্রায় লৌহাজাতীয় উপাদানের ঘাটতি (১৭%) থাকা সত্ত্বেও (সিরামফেরিটিন <১২ মাইক্রোগ্রাম/লিটার) যেসব স্থানে ইন্টারভেনশন কার্যক্রম চালু করা হয় নি সেসব স্থানে তাদের মধ্যে লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণের হার ছিলো মাত্র শতকরা আটভাগ। তবে কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি-পরামর্শ কার্যক্রম এবং সেইসাথে বিনামূল্যে আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন

এনেছে, যার ফলে দেখা গেছে, বিআইএনপি এলাকায় ২১% কিশোরী লৌহজাতীয় সম্পূরক খাদ্যউপাদান গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য কিশোরীদের শক্তিশালী খাদ্যগ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রাম এলাকায় প্রতিদিনের খাবারের সাথে আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ ও মাংস এবং চর্বির প্রধান উৎস হচেছ ডিম ও দুধ। উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যহ আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণের বিষয়টি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পুষ্টি উন্নয়নের জন্য দারিদ্র এবং ক্ষুধা নিরসনের গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য।

বিভিন্ন উপায়ে কিশোরীদের স্বল্পপুষ্টি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কিশোরীদের পুষ্টিজ্ঞান ও চর্চার পরিবর্তনসাধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উপযুক্ত একটি বিষয় হচ্ছে মূল সেবাকার্যক্রমের আওতায় কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি-পরামর্শ কার্যক্রম চালু করা। কিশোরীরা যেহেতু একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নয় এবং তাদের মাতাপিতাই তাদের পক্ষে সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু মাতাপিতা, বিশেষকরে মায়ের কাছে কিশোরীর উল্লেখযোগ্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকা-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা অপরিহার্য।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

ভিব্রিও কলেরি ও১ এল টর-এর ইনাবা সেরোটাইপের পুনরুত্থান এবং টেট্রাসাইক্লিনের প্রতি এর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি

আমরা ২০০৫ সালের জুন মাসে এক প্রতিবেদনে *ভি. কলেরি* ও১ (কলেরার জীবাণু) এল টর-এর 'ওগাওয়া' সেরোটাইপের পুনরুত্থানের কথা জানিয়েছিলাম যা এর আগের প্রধান সেরোটাইপ 'ইনাবা'-কে প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থানচুত করে ফেলেছিলো (১)। আমরা দেখেছি যে, প্রাপ্তবয়স্কদের মারাত্মক কলেরা চিকিৎসায় সচরাচর ব্যবহৃত ওষুধ টেট্রাসাইক্লিন (এবং ডক্সিসাইক্লিন) এবং শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের কলেরা চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ ইরিথ্রোমাইসিনের বিরুদ্ধে উভয় সেরোটাইপই প্রতিরোধ-ক্ষমতা অর্জন করেছে। যদিও 'কিরবি-বয়ার' পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এধরনের বহু ওষুধ-প্রতিরোধী দুই ধরনের সেরোটাইপের *ভি. কলেরি* এখনো সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের প্রতি সংবেদনশীল, তবে 'ই-টেস্ট' নামক অন্য পরীক্ষায় জানা যায় যে, *ভি. কলেরি*-র বংশ বৃদ্ধি রোধে আগের চাইতে বেশি পরিমাণে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দরকার যা ওষুধটির কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ইংগিত দেয়। ইতোপূর্বে পরিচালিত গবেষণায় মারাত্মক কলেরার চিকিৎসায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের যে কার্যকারিতা আমরা দেখেছি (৩,৪), সে তুলনায় আইসিডিডিআর,বি-র ঢাকা হাসপাতালে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ওষুধটির কার্যকারিতা অনেক কম দেখা গেছে (২)। প্রধান সেরোটাইপের পরিবর্তন ও নতুন গোত্রের (ক্লোন) আবির্ভাব এবং সচরাচর ব্যবহৃত ওষুধসমূহের বিরুদ্ধে এগুলোর প্রতিরোধ-ক্ষমতা লাভ স্বাভাবিক যা এর আগেও দেখা গেছে (৫-৭)। তবে প্রায় দুবছর ধরে *ভি. কলেরি*-র এ-ধরনের ওষুধ প্রতিরোধ প্রবণতা ধরে রাখার-ক্ষমতা আগে কখনো দেখা যায় নি।

গত প্রতিবেদনের পর থেকে এ-পর্যন্ত ঢাকা হাসপাতালের *ভি. কলেরি*-র মধ্যে আমরা দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। প্রথমত, 'ইনাবা' সেরোটাইপের পুনরুত্থান এবং 'ওগাওয়া' সেরোটাইপের হার নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়া (চিত্র ১)। দ্বিতীয়ত, টেট্রাসাইক্লিন-প্রতিরোধী *ভি. কলেরি* ও১-এর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া (চিত্র ২)। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যেখানে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৭৫% *ভি. কলেরি* ও১ জীবাণু (উভয় সেরোটাইপ) টেট্রাসাইক্লিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতার অধিকারী ছিলো, সেখানে ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে তা কমে ১০%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। 'ওগাওয়া' সেরোটাইপের প্রায় বিলুপ্ত হওয়া এবং টেট্রাসাইক্লিনের প্রতি *ভি. কলেরি*-র সংবেদনশীলতা ফিরে আসা এক খুশির খবর। প্রাপ্তবয়স্কদের কলেরা চিকিৎসায় ৩০০ মিলিগ্রাম ডক্সিসাইক্লিনের (টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় একটি ওষুধ) শুধুমাত্র একটি ডোজ ব্যবহার কার্যকর ও ব্যয় সাশ্রয়ী। তবে কম-বয়সী শিশু এবং গর্ভবতী ও শিশুকে বুকের দুধপ্রদানকারী মায়েদের চিকিৎসায় ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করা নিষেধ। শিশুদের কলেরা চিকিৎসায় সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের একটি মাত্র ডোজই কার্যকর, তবে *ভি. কলেরি*-র বিরুদ্ধে এই ওষুধটির কার্যকারিতা কমে যাওয়ার কারণে এই এক ডোজের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যাবে না। একটি ছোট গবেষণায় (পাইলট স্টাডি) আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের একটিমাত্র ডোজ দিয়ে চিকিৎসার তুলনায় ১২ ঘণ্টা পর পর তিন দিনের (ছয়টি ডোজ) চিকিৎসা ডায়রিয়া ও জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর (ব্যক্তিগত যোগাযোগ: সাহা এবং তার সহকর্মীবৃন্দ)। আইসিডিডিআর,বি-তে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, *শিগেলা ডিসেনটারি* টাইপ ১-এর সংক্রমণে মারাত্মক আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টা পর পর তাদের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম করে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দিয়ে তিন দিনের চিকিৎসা নিরাপদ (৮)। তাই শিশুদের কলেরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা ১২ ঘণ্টা পর পর তাদের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম করে, ও বুকের দুধপ্রদানকারী মায়েদের ৫০০ মিলিগ্রাম করে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দিয়ে তিন দিনের চিকিৎসা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তবে গর্ভবর্তী মায়েদের কলেরা চিকিৎসায় কোনো ওষুধ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পানিশুন্যতা পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় এবং স্বাভাবিক খাবার দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

চিত্র ১: ২০০৬ সালে ঢাকা হাসপাতাল সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত ভি. কলেরি *ও১ সেরোটাইপসমূহের মাসওয়ারী বিন্যাস*

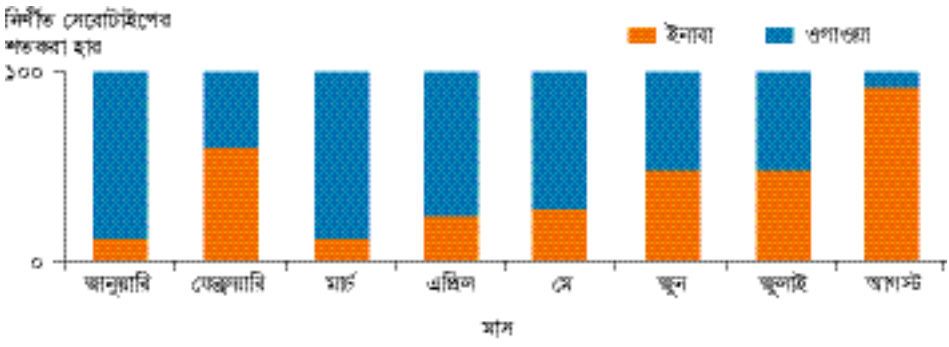

চিত্র ২: ভি. কলেরি ও১-এর টেট্রাসাইক্লিন ও ইরিথ্রোমাইসিন প্রতিরোধের হার: ঢাকা হাসপাতাল সার্ভিলেন্স, ২০০৬

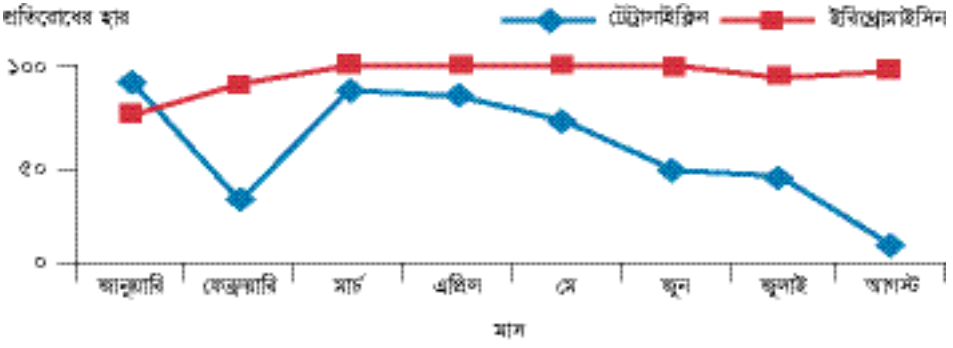

প্রতিবেদন: ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: সেপ্টেম্বর ২০০৫-আগস্ট ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ১৯৯)	ভি. *কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৬৯২)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৯.১	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৭.০	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৪.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৫.৭	৩.২
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৯.৫	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৩১.৮
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২২.৫
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: সেপ্টেম্বর ২০০৫-আগষ্ট ২০০৬

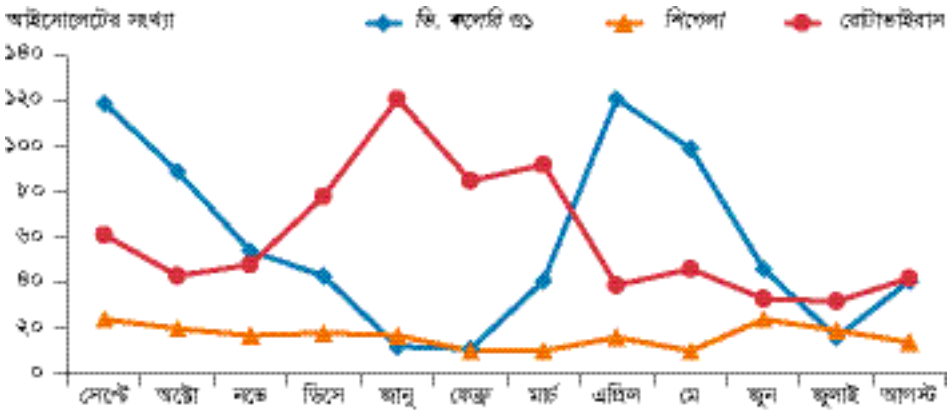

১০৬টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাইমারি (সংখ্যা=৯০)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৬)	(সংখ্যা=১০৬)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২৭ (৩০.০)	৬ (৩৭.৫)	৩৩ (৩১.১)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১২ (১৩.৩)	৫ (৩১.৩)	১৭ (১৬.০)
ইথামবিউটাল	১১ (১২.২)	৩ (১৮.৮)	১৪ (১৩.২)
রিফামপিসিন	১২ (১৩.৩)	৭ (৪৩.৮)	১৯ (১৭.৯)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৫ (৫.৬)	৪ (২৫.০)	৯ (৮.৫)
অন্যান্য ওষুধ	৩৭ (৪১.১)	১০ (৬২.৫)	৪৭ (৪৪.৩)

() শতকরা হার * এক মাস বার তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০০৬ (সংখ্যা=২৯)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীল (%)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	৯৬.৬	৩.৪	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০.৩	০.০	৮৯.৭
পেনিসিলিন	১৭.২	২৭.৬	৫৫.২
স্পেকটিনোমাইসিন	৯৬.৬	৩.৪	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	৬.৯	০.০	৯৩.১
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: মে-জুলাই ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৮	৮ (১০০.০)	০	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৮	৫ (৬২.০)	০	৩ (৩৮.০)
ক্লোরামফেনিকল	৮	৮ (১০০.০)	০	০ (০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৮	৮ (১০০.০)	০	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৮	৮ (১০০.০)	০	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	৮	২ (২৫.০)	০	৬ (৭৫.০)
অক্সাসিলিন	৮	৮ (১০০.০)	০	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশ ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: মে-জুলাই ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৬	৭ (২৭.০)	০	১৯ (৭৩.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৬	৭ (২৭.০)	০	১৯ (৭৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	২৫	৭ (২৮.০)	০	১৮ (৭২.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৬	২৬ (১০০.০)	০	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৫	২৪ (৯২.০)	১ (৪.০)	১ (৪.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

বান্দরবান হাসপাতালের সামনে গবেষকবৃন্দ

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো : অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলংঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমন্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
চার্লস পি. লারসন
এমিলি গারলি

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
রাশিদুল হক
নুরুল আলম
এমএ সালাম

অতিথি সম্পাদক:
পাভানি রাম
এলিজাবেথ ওলিভেরাস
রোনাল্ড রোজেনবার্গ

কপি সম্পাদনা, বাংলা অনুবাদ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহ্‌বুব-উল-আলম